ডলারের মূল্যরহস্য

নাসিম আহমেদ

এক সময় রোমে সৈন্যদের বেতন দেয়া হতো নুনের মাধ্যমে। সবচেয়ে দুর্লভ হিসেবে বিবেচিত ছিল নুন। সৈন্যদের মাসিক বেতন তাই নির্ধারিত হয়েছিল নুনের পরিমাণে। বর্তমান সময়ে হাজার অনুরোধেও কেউ নুনকে বেতন হিসেবে নেবে না। সহজলভ্য এই পদার্থটি বেতন হিসেবে নিতে হলে প্রতিমাসে আড়ত খুলতে হবে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির জন্য আড়ত ব্যবস্থার বিকল্প নেই। বর্তমান সময়ে অবশ্য নুনের জৌলুশ কমেছে। সে জায়গায় ডলার পেয়েছে স্থান। আমেরিকান ডলার বর্তমান সময়ে সবচেয়ে আলোচনার বিষয়। ডলার ও টাকার বিনিময় হারের পরিবর্তন এখন শুধু অর্থনীতিবিদ বা ব্যবসায়ীদের আগ্রহের বিষয় না। এই তারতম্যের জন্য যে বেশ ভালো পরিমাণ লাভ হতে পারে এটা সাধারণ মানুষ খুব ভালো করে বোঝে। ২০০৪-এর সেপ্টেম্বরে শুনেছিলাম এক বন্ধুকে পরামর্শ দেয়া হচ্ছিল প্রায় ৪ হাজার ডলার দেশে নিয়ে আসতে। বুদ্ধিটা এমন- সেপ্টেম্বরে ডলার নিয়ে এসে এবছর ভাঙানো। ভাবছেন কেন দেরি করার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে? উত্তর খুব সহজ- এই কয়েক মাসের বিলম্বে আয় হতে পারে প্রায় ৩৫ হাজার টাকা। সেপ্টেম্বরে প্রতি ডলারের জন্য পাওয়া যেত ৫৮.৩৬ টাকা। এটা কার্ব মার্কেট ছাড়াই। জানুয়ারি ২০০৬ য়ে-তা বেড়ে যায় ৬৭ টাকায়। ডলার-মূল্যের এই পরিবর্তনের সুযোগ নিলে প্রায় ৩৫ হাজার টাকা আয় হয়ে যাবে আপনা-আপনি। কিছু করতে হবে না। ঘরে বসে মাছি মারবেন, খাবেন আর টিভি দেখবেন। এটার মধ্যে শেয়ার মার্কেটের ঝুঁকি নেই। নেই বারবার কোনো কিস্তি দেয়ার ব্যাপার। কোনো কায়িক পরিশ্রম ছাড়া মাসের বেশ খানিকটা খরচ মিটে যাবে। এমন মহাসুযোগ যখন সামনে, তখন লোকজন ডলার-মূল্যের পদচারণায় আগ্রহী হয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। তাই ডলার-মূল্য এখন কমবেশি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

ডলার বাজার

অর্থনীতির তত্ত্ব অনুযায়ী যেকোনো পণ্যের বাজারে চাহিদা এবং যোগানের ভিত্তিতে মূল্যের গতিবিধি নির্ভর করে। বিভিন্ন সময়ের চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন মূল্যের ওঠানামার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। উন্নত দেশগুলোতে পণ্যের সব বাজারেই এই তত্ত্বটি সত্য। আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ১ ডলারের ক্রয়-বিক্রয় মূল্যের পার্থক্য ১৫-২০ পয়সার বেশি নয়। অর্থাৎ ১ ডলারকে পাউন্ডে রূপান্তরিত করতে যদি ৭৫ পেন্স পাওয়া যায়, তাহলে ১ পাউন্ডে ১ ডলারের কিছু বেশি পাওয়া যাবে। আমাদের দেশের মতো ক্রয়-বিক্রয় ব্যবধান ২ টাকার মতো কখনো হবে না। ডলার-মূল্যের এই ঊর্ধ্বগতির একটি বড় কারণ বাংলাদেশে টাকার বাজারে বহুস্তর বিশিষ্ট মূল্যের উপস্থিতি। এই মূল্যের বহুস্তরের একটি কারণ এ দেশে ব্যাংকগুলোর লেনদেনের পার্থক্য। দুটো প্রক্রিয়ায় লেনদেন হয়। প্রথমটি প্রতিষ্ঠিত আন্তঃব্যাংক বিনিময় হার। প্রতিদিন পত্রিকা বা ব্যাংকে আমরা যে বিনিময় হার দেখি, যেখানে বর্তমানে ডলারের মূল্য ৬৬-৬৭ টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক বা বিভিন্ন অর্থনীতি রিপোর্টে এই হিসেবের মাধ্যমেই বলা হয়েছে টাকার অবমূল্যায়ন প্রায় ৯%। কিন্তু হিসেবটি একটু অন্যভাবে দেখলে এই অবমূল্যায়নের পরিমাণ বেড়ে যায় ১২-১৪%। এই বৈষম্য হবে অন্য বিনিময় মুদ্রা ধরলে। এই বিনিময় হারটি তৃতীয় মুদ্রার বাজার হার। সাদা বাংলায় ক্রেতাকে ব্যাংক বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ডলার দেয় অন্যান্য মুদ্রা থেকে রূপান্তর করে। প্রথমে তারা টাকার মাধ্যমে ইয়েন, পাউন্ড, ইউরো ইত্যাদি কিনে তা ব্যাংকের কাছে বিক্রি করে। ব্যাংকগুলো তৃতীয় মুদ্রাকে রূপান্তর করে ডলারে। এরপর তারা ক্রেতাদের চাহিদা মেটায়। আন্তর্জাতিক বাজারে ইউরো, পাউন্ড, ইয়েন সহজে রূপান্তরযোগ্য। তাই এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করাটা নিয়মিত হয়ে উঠছে। অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, তাহলে কেন খামোখা ঝামেলা করা। ডলারে লেনদেন করলেই হয়? এর উত্তর খুব সহজ। ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্য অনেকের আগ্রহের বস্তু। নিজেকেই জিজ্ঞেস করুন ইয়েন বা ইউরোর বিপরীতে টাকার মূল্য কতো? বলতে পারবেন না। চট করে মনেও আসবে না। ডলারেরটা একদম ঠিক না হলেও কাছাকাছি বলতে পারবেন। কারণ কম-বেশি আমরা সবাই খবর রাখি। এই সর্বসাধারণের অনাগ্রহের জন্যই বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে টাকার লেনদেন হয় ডলারের ঊর্ধ্বগতির সময়ে। তবে এটাই একমাত্র কারণ নয়। ডলারের মূল্য আরো বাড়বে। এই অনুমান থেকেই ডলার কিছুটা ধরে রাখা হয়। অন্যান্য মুদ্রাও রাখা হয় তবে মূলতঃ তা মুদ্রা বাজারে ঝুঁকি কমাতে। তার ওপর তুলনামূলক কম হারে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে তৃতীয় মুদ্রা কিনতে পারলে এর বিক্রয় ব্যবধানটি বাড়ে। তাই ব্যাংকের লাভও হয় বেশি। এ জন্য আমরা চোখ না রাখলেও ব্যাংকাররা তৃতীয় মুদ্রার খবর রাখেন সব সময়। শুধু খবরই রাখেন না, অংশও নেন। এ জন্যই ২০০৪ সালে তৃতীয় মুদ্রার বাজার লেনদেন শুরু হলেও গত এক বছরে আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রাবাজারের প্রায় ৯০% হচ্ছে তৃতীয় মুদ্রার মাধ্যমে।

টেবিলের চিত্র দেখলে প্রথমেই আমাদের

আন্তর্জাতিক মুদ্রার সঙ্গে টাকার বিনিময় হার

মাস	ডলার	ইয়েন	ইউরো	পাউন্ড
জানুয়ারি ২০০২	৫৭.৫০	০.৪৮	৪৯.৫৩	৮১.২৮
আগস্ট ২০০৩	৫৭.৭০	০.৪৯	৬৩.৩৯	৯১.০১
সেপ্টেম্বর ২০০৩	৫৮.৩৬	০.৫২	৬৭.৯৯	৯৭.০০
নবেম্বর ২০০৪	৫৮.৩৯	০.৫৬	৭৭.৪১	১১১.৩৬
* সেপ্টেম্বর ২০০৫	৫৯.৬০	০.৫২	৭১.৮৭	১০৫.৪৫
* অক্টোবর ২০০৫	৫৯.৬০	০.৫১	৭১.৪৭	১০৫.৪৩
* নবেম্বর ২০০৫	৫৯.৬০	০.৪৯	৭০.২৬	১০৩.২৩
* ডিসেম্বর ২০০৫	৫৯.৬০	০.৫০	৭০.৫৬	১০২.৪১

* গড় হিসাব। সূত্র : ইন্টারনেট

দৃষ্টি আটকে যায় নবেম্বরে ২০০৪ সালে। এ সময় তেলের উর্ধ্বমূল্য ও চাহিদা বৃদ্ধি আন্তর্জাতিক বাজারে প্রভাব ফেলে। এরপর তেলের দাম সময়ানুযায়ী কমে এলেও আমাদের মুদ্রাবাজারে খুব বেশি প্রভাবিত হয়নি। ডলারের দাম তুলনামূলক কাছাকাছি থাকলেও তৃতীয় মুদ্রার বাজারে তা থাকেনি। কারণ ২০০৫ সালের শেষে তৃতীয় মুদ্রার লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে মুদ্রাবাজারে প্রতিটি দামের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। যোগান এবং চাহিদার পরিবর্তন হওয়ায় মূল্য ধীরে ধীরে কমে যায়। চাহিদার তুলনায় যোগান এবং ভবিষ্যৎ মার্কেটের মূল্য হিসেবে দাম কিছুটা কমে যায়। এই মূল্যহ্রাসের কারণে ব্যাংকগুলো বেশ লাভ করে। পৃথিবীর অন্যান্য ব্যাংক যেখানে প্রতি ডলারে ১০-৩০ পয়সা ব্যবসায় সন্তুষ্ট থাকে, সেখানে আমাদের ব্যাংকগুলো ২ টাকার ওপরে ব্যবসা করে ফেলে।

মূল্য বৃদ্ধির অন্যান্য কারণ

ডলারের মূল্য বৃদ্ধি শুধু তৃতীয় বাজারের কারণেই হয়নি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তেলের মূল্য বৃদ্ধিও ডলারের মূল্য বাড়িয়েছে। অতীতের সমপরিমাণ তেলের জন্য সরকারকে বেশি ডলার পরিশোধ করতে হয়েছে। যদিও পেট্রলের চেয়ে ডিজেল ও কেরোসিনের আমদানি ছিল বেশি। কারণ ডিজেল ও কেরোসিন আমরা সেচ, কারখানায় ব্যবহার করে থাকি। আন্তর্জাতিক বাজারে ইস্পাত, চিনি, চাল ইত্যাদির দাম ১৫০-২০০ ডলার বৃদ্ধি আমাদের জন্য কাল হয়েছে। কারণ বিচ্ছিন্ন যন্ত্রাংশ আমদানি করতে হয়েছে। গত বছরের তুলনায় আমাদের আমদানি বেড়েছে প্রায় ১৯%। রেমিটেন্স বেড়েছে সাড়ে ২২%। তাই রেমিটেন্স বেড়েছে বলে 'হৈ চৈ' করলেও প্রকৃতপক্ষে রেমিটেন্সের প্রভাব অর্থনীতিতে ব্যাপকভাবে পড়েনি। রপ্তানি বেড়েছে প্রায় ১৫%। এতে রাজনৈতিক বাহবা পাওয়া যেতে পারে, অর্থনৈতিক খাতে নয়। কারণ, আমদানি খাতে ডলারের চাহিদায় এই প্রবৃদ্ধি যথেষ্ট নয়। তার ওপরে রপ্তানির ক্ষেত্রে আমরা ন্যায্য ডলার পাই বহুদিন পরে। তাই লাভের অঙ্কটি বহুদিন শুধু কাগজেই থাকে। ডলারে রূপান্তরিত হয় বেশ পরে। দেশে রপ্তানি বাড়াতে বিদেশের আমদানিকারদের সুবিধা দেয়া হয়েছে ধীরে ধীরে বিল পরিশোধ করতে। এই ধীরগতিও ডলারের মূল্যে প্রভাব ফেলছে। চাপ ফেলছে মুদ্রাবাজারে। তৈরি করছে বাড়তি চাহিদার চাপ, এ জন্যই কলমানি রেট ঈদের আগে বেড়ে গিয়েছিল। ডলারের জন্য টাকা জোগাড় করতে বেশ কিছু ব্যাংককে ধার করতে হয়েছিল অন্যান্য ব্যাংক থেকে। এই তহবিলের যোগানের জন্য যে হারে টাকা পরিশোধ করা হয় তাই কলমানি রেট। এই ক্রমাগত চাপেই কলমানি রেট ২০% ওপরে উঠে যায়।

কী করণীয়

দেশে যখন মানি চেঞ্জারের শুরু, তখন সরকার অনেক বড় বড় কথা বলেছিল। তাদের যুক্তি ছিল, ব্যাংক ছাড়াও এখন মুদ্রাবাজারে বিনিময় হবে। সুতরাং অযাচিত মুদ্রাস্ফীতি থামবে। টাকাকে ভাসমান মুদ্রা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার পেছনেও এই যুক্তি দেখানো হয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়লে বাজারে ক্রেতাদের সুবিধা হবে- এই ছিল যুক্তি। খোঁড়া যুক্তি। কারণ যখন বিভিন্ন ব্যাংক মুদ্রা বিনিময়ে টাকা বানায়, বাকিদের পিছিয়ে থাকার যুক্তি নেই। সবাই তো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। লাভ করাটাই মুখ্য যখন তখন, ডলার-টাকার ক্রয়-বিক্রয় ব্যবধান কামনোর মতো দুঃসাহসিক পদক্ষেপ তারা নেবেই বা কেন? সাধারণ ক্রেতা বা ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে! তা তো এ দেশে সম্ভব নয়। আর ক্রেতারাও তো অসহায়। কারণ ভ্রমণই হোক বা ব্যবসা, তাদের তো ডলার কিনতেই হবে। এভাবে চলতে থাকলে ডলারের মূল্য ৭০-৭৫ টাকায় চলে যেতে পারে। দেশে ডলারে চাহিদা কিছুটা পূরণ করা সম্ভব, যদি বড় ধরনের বিদেশী বিনিয়োগ হয়। যদি রপ্তানি আরো বৃদ্ধি পায়। তবে এগুলো সবই সময় সাপেক্ষ। তার পরও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ নেয়া খুবই জরুরি। বাংলাদেশ ব্যাংকের ডলার বন্ড আছে। কিন্তু এটা বাজারজাতকরণের কোনো উদ্যোগ নেই। অথচ এটা বাজারজাত করতে পারলে ডলার-বাজারে কিছুটা হলেও স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে। এই তো কিছু দিন আগে শ্রীলঙ্কায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রায় ৫০ কোটি ডলার তুলেছিল।

অথচ অর্থমন্ত্রী ও গভর্নর খালি কথাই বলে যাচ্ছেন, কোনো উদ্যোগ নেয়ার প্রয়োজনবোধ তাদের মধ্যে নেই। এর কারণ কি বিদেশী ব্যাংকগুলো বিশেষ করে যারা মুদ্রাবাজারের মূল খেলোয়াড় তাদের কোনো চাপ? নাকি তারা মুদ্রাবাজার ভালো বোঝেন না? অনেকেই জানেন গভর্নরের হাত-পা বাঁধা। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ছাড়া অনেক কিছু তিনি করতে পারেন না। কিন্তু অর্থমন্ত্রী? তিনি তো নির্বাচিত জনগণের মুখপাত্র। জনগণের দিকে তিনি তাকাচ্ছেন না কেন? অতিথি পাখি নিয়ে হাস্যকর উক্তি করা তার দায়িত্ব নয়। বরং রপ্তানি বৃদ্ধি, মুদ্রাবাজার স্থিতিশীল করা তার দায়িত্ব। স্টিগলিতসের বইটি তিনি পড়েছেন কি না সন্দেহ হয়। দেশের নীতিমালা নির্ধারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন যে প্রয়োজন তা স্যামুয়েল সনের মতো সহজপাঠ্য অর্থনীতির বইয়েও আছে। মাড্ডালা, মিলার, হ্যারি জনসন, মরিন ক্রুপার প্রমুখ প্রথম সারির অর্থনীতি গবেষকদের কথা না হয় বাদই দিলাম। অবশ্য সিএ পাস লোক অবশ্য অর্থনীতির কী বোঝেন? তার কাছে সবই হয়তো ডেবিট-ক্রেডিট। দু'পাশে সমান হলেই চলে।

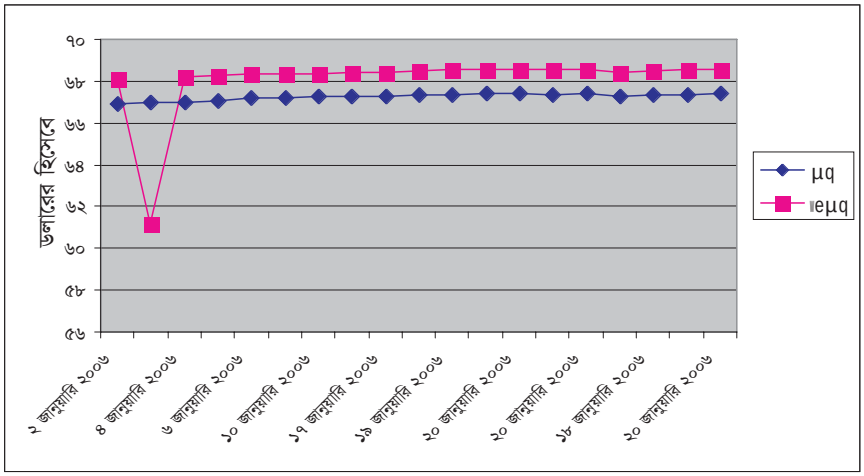

অর্থনীতির বাজার যদি শক্তিশালী না করা যায় তাহলে ব্যবসার ঝুঁকি বাড়বে। ফলে বিনিয়োগকারী আগ্রহ হারাবে। আমরা হারাবো বৈদেশিক বিনিয়োগ। আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক বিনিয়োগের বিকল্প নেই। অন্তত দেশকে রাজনীতিবিদরা যে পর্যায়ে এনেছেন সেই পর্যায়ে এটাই একমাত্র পথ। বৈদেশিক বিনিয়োগ, রপ্তানিমুখী প্রকল্পের সফলতা, দক্ষ জনশক্তি রপ্তানিই দেশকে এগিয়ে নিতে পারবে।